

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধ্বনিতত্ত্ব

বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

কোনো ভাষার বাক্ প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি (Sound) পাই। বাংলা ভাষাতেও কতগুলো মৌলিক ধ্বনি আছে।

বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয় : ১. স্বরধ্বনি ও ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. স্বরধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound)। যেমন – অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound) যেমন– ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণ : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন–ক ইত্যাদি।

বর্ণমালা : যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলা হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি ‘অ’ স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন – ক্ + অ = ক, ইত্যাদি। স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জনের নিচে ‘হস্’ বা ‘হল’ চিহ্ন (্) দিয়ে লিখিত হয়।

বাংলা বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশটি (৩৯)টি।

১. স্বরবর্ণ	:	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ঐ ও ঔ	১১টি
২. ব্যঞ্জনবর্ণ	:	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি
		চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি

ট ঠ ঢ ঢ ণ	৫টি
ত থ দ ধ ন	৫টি
প ফ ব ভ ম	৫টি
য র ল	৩টি
শ ষ স হ	৪টি
ড় ঢ ঝ ঞ	৪টি
ৎ ঳ ং	৩টি

মোট ৫০টি

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ঐ, ঔ - এ দুটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন। যেমন - অ + ই = ঐ , অ + উ = ঔ

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সর্ধক্ষিপ্ত রূপ

কার ও ফলা

কার : স্বরবর্ণের এবং কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন - অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

এই রূপ বা form শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত - যে কোনো অবস্থানে বসতে পারে। স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনিটির বর্ণ সর্ধক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সর্ধক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সর্ধক্ষিপ্ত স্বর বা 'কার'। যেমন - 'আ'-এর সর্ধক্ষিপ্ত রূপ (া)। 'ম'-এর সঙ্গে 'আ'-এর সর্ধক্ষিপ্ত রূপ ' া ' যুক্ত হয়ে হয় 'মা'। বানান করার সময় বলা হয় ম এ আ-কার (মা)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন - আ-কার (া), ই-কার (ি), ঈ-কার (ি), উ-কার (ঊ), ঊ-কার (ঊ), ঋ-কার (ঋ), এ-কার (এ), ঐ-কার (ঐ), ও-কার (ও), ঔ-কার (ঔ)। অ-এর কোনো সর্ধক্ষিপ্ত রূপ বা 'কার' নেই।

আ-কার (া) এবং ঈ-কার (ি) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয়। ই-কার (ি), এ-কার (এ) এবং ঐ-কার (ঐ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয়। উ-কার (ঊ), ঊ-কার (ঊ) এবং ঋ-কার (ঋ) ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়। ও-কার (ও) এবং ঔ-কার (ঔ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিকে যুক্ত হয়।

উদাহরণ : মা, মী, মি, মে, মৈ, মু, মূ, ম্, মো, মৌ।

ফলা : স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয়, তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণও কোনো কোনো স্বর কিংবা অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সর্ধক্ষিপ্তও হয়। যেমন-ম্য, ম্র ইত্যাদি। স্বরবর্ণের সর্ধক্ষিপ্ত রূপকে যেমন 'কার' বলা হয়, তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের সর্ধক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় 'ফলা'। এভাবে যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয়, তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ করা হয়। যেমন- ম-এ য-ফলা = ম্য, ম-এ র-ফলা = ম্র, ম-এ ল-ফলা = ম্ল, ম-এ ব-ফলা = ম্ব। র-ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের পরে হলে লিখতে হয় নিচে। 'ম্র'; আবার 'র' যদি ম-এর আগে উচ্চারিত হয়, যেমন-

ম-এ রেফ 'র্ম' তবে লেখা হয় ওপরে, ব্যঞ্জনটির মাথায় রেফ (') দিয়ে। 'ফলা' যুক্ত হলে যেমন, তেমনি 'কার' যুক্ত হলেও বর্ণের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেমন – হ-এ উ-কার=হু, গ-এ উ-কার = গু, শ-এ উ-কার = শূ, স-এ উ-কার=সু, র-এ উ-কার = রু, র-এ উ-কার = রু, হ-এ ঞ-কার=হু।

ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শধ্বনি (Plosive)কে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে পাঁচটি গুচ্ছে বা বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় ঐ বর্ণীয় ধ্বনি। বর্ণভুক্ত বলে এ ধ্বনির চিহ্ন গুলোকেও ঐ বর্ণীয় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন–

ক খ গ ঘ ঙ	ধ্বনি	হিসেবে	এগুলো	কণ্ঠ্য	ধ্বনি,	বর্ণ	হিসেবে	'ক'	বর্ণীয়	বর্ণ
চ ছ জ ঝ ঞ	"	"	"	তালব্য	"	"	"	'চ'	"	"
ট ঠ ড ঢ ণ	"	"	"	মূর্ধন্য	"	"	"	'ট'	"	"
ত থ দ ধ ন	"	"	"	দন্ত্য	"	"	"	'ত'	"	"
প ফ ব ভ ম	"	"	"	ওষ্ঠ্য	"	"	"	'প'	"	"

উচ্চারণের স্থানভেদে ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ

ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারণক জিহ্বা ও ওষ্ঠ। আর উচ্চারণের স্থান হলো কণ্ঠ বা জিহ্বামূল, অগ্রতালু, মূর্ধা বা পশ্চাৎ দন্তমূল, দন্ত বা অগ্র দন্তমূল, ওষ্ঠ্য ইত্যাদি।

উচ্চারণের স্থানের নাম অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় : ১. কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় ২. তালব্য বা অগ্রতালুজাত, ৩. মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়, ৪. দন্ত্য বা অগ্র দন্তমূলীয় এবং ৫. ওষ্ঠ্য।

ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে প্রত্যঙ্গ গুলো ব্যবহৃত হয় :

- ১ – ঠোঁট (ওষ্ঠ ও অধর)
- ২ – দাঁতের পাটি
- ৩ – দন্তমূল, অগ্র দন্তমূল
- ৪ – অগ্রতালু, শক্ত তালু
- ৫ – পশ্চাত্তালু, নরম তালু, মূর্ধা
- ৬ – আলজিভ
- ৭ – জিহ্বাগ্র
- ৮ – সম্মুখ জিহ্বা
- ৯ – পশ্চাদজিহ্বা, জিহ্বামূল
- ১০ – নাসা-গহ্বর
- ১১ – স্বর-প্লব, স্বরতন্ত্রী
- ১২ – ফুসফুস

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
জিহ্বামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ শ য ষ	তালব্য বর্ণ
পশ্চাৎ দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ ঝ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত্য বর্ণ
ওষ্ঠ	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

দ্রষ্টব্য : খঙ-ত (ৎ)-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি ‘ত’ বর্ণের হস্-চিহ্ন যুক্ত (ত্)-এর রূপভেদ মাত্র।

২৪ ~ – এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ।

ঙ ঞ ণ ন ম-এ পাঁচটি বর্ণ এবং ২৪ ~ যে বর্ণের সঙ্গে লিখিত হয় সে বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নিঃসৃত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়; অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোকে বলে অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি। আর এগুলোর বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা : স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। যেমন- ইংরেজি full-পূর্ণ এবং fool বোকা। শব্দ দুটির প্রথমটির উচ্চারণ হ্রস্ব ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ দীর্ঘ। হ্রস্ব বর্ণের উচ্চারণ যে দীর্ঘ হয় এবং দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ যে হ্রস্ব হয়, কয়েকটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে। যেমন-ইলিশ, তিরিশ, উচিত, নতুন-লিখিত হয়েছে হ্রস্ব ই-কার ও হ্রস্ব - উ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে দীর্ঘ। আবার দীন, ঈদুল ফিতর, ভূমি-লিখিত হয়েছে দীর্ঘ ঈ-কার এবং দীর্ঘ উ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণে হ্রস্ব হয়ে যাচ্ছে। একটিমাত্র ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ সবসময় দীর্ঘ হয়। যেমন-দিন, তিল, পুর ইত্যাদি।

যৌগিক স্বর : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বর বলা হয়। যেমন-অ + ই = অই (বই), অ + উ = অউ (বউ), অ + এ = অয়, (বয়, ময়না), অ + ও = অও (হও, লও)।

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশ।

আ + ই = আই (যাই, ভাই); আ + উ = আউ (লাউ); আ + এ = আয় (যায়, খায়); আ + ও = আও (যাও, খাও); ই + ই = ইই (দিই); ই + উ = ইউ (শিউলি); ই + এ = ইয়ে (বিয়ে); ই + ও = ইও (নিও, দিও); উ + ই = উই (উই, শূই); উ + আ = উয়া (কুয়া); এ + আ=এয়া (কেয়া, দেয়া); এ + ই = এই (সেই, নেই); এ + ও = এও (খেও); ও + ও = ওও (শোও)।

বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে: ঐ এবং ঔ। উদাহরণ : কৈ, বৌ। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ ও উচ্চারণগত নাম

আগে আমরা দেখেছি যে, পাঁচটি বর্ণ বা গুচ্ছে প্রত্যেকটিতে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। এগুলো স্পৃষ্ট ধ্বনিজ্ঞাপক। ক থেকে ম পর্যন্ত এ পঁচিশটি ব্যঞ্জনকে স্পর্শ ব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ১. অঘোষ এবং ২. ঘোষ।

১. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। যেমন— ক, খ, চ, ছ ইত্যাদি।

২. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, তাকে বলে ঘোষ ধ্বনি। যেমন—গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি।

এগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ক. অল্পপ্রাণ এবং খ. মহাপ্রাণ।

ক. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন—ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

খ. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন—খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

উষ্মধ্বনি : শ, ষ, স, হ — এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এগুলোকে বলা হয় উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় উষ্মবর্ণ।

শ ষ স — এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ, আর ‘হ’ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

অন্তঃস্ব ধ্বনি : য় (Y) এবং ব্ (W) এ দুটো বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শ ও উষ্মধ্বনির মাঝামাঝি। এজন্য এদের বলা হয় অন্তঃস্ব ধ্বনি।

ধ্বনির উচ্চারণ বিধি

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

ই এবং ঈ—ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা এগিয়ে আসে এবং উচ্চ অগ্রতালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পৌঁছে। এ ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান ই—ধ্বনির মতো সম্মুখেই হয়, কিন্তু একটু নিচে এবং আ—ধ্বনির বেলায় আরও নিচে। ই ঈ এ (অ) ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা এগিয়ে সম্মুখভাগে দাঁতের দিকে আসে বলে এগুলোকে বলা হয় সম্মুখ ধ্বনি। ই এবং ঈ—র উচ্চারণের বেলায় জিহ্বা উচ্চ থাকে। তাই এগুলো উচ্চসম্মুখ স্বরধ্বনি। এ মধ্যাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি এবং অ নিম্নাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি।

উ এবং ঊ—ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা পিছিয়ে আসে এবং পশ্চাৎ তালুর কোমল অংশের কাছাকাছি ওঠে। ও—ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা আরও একটু নিচে আসে। অ—ধ্বনির বেলায় তার চেয়েও নিচে আসে। উ ঊ ও অ—ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা পিছিয়ে আসে বলে এগুলোকে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলা হয়। উ ও ঊ—ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চ থাকে বলে এদের বলা হয় উচ্চ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ও মধ্যাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি এবং অ—নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

বাংলা আ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে অবস্থিত বলে আ-কে কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি এবং বিবৃত ধ্বনিও বলা হয়।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো

	সম্মুখ, ওষ্ঠাধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয়, ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ, ওষ্ঠাধর গোলাকৃত
উচ্চ	ই ঈ		উ ঊ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

শব্দে অবস্থানভেদে অ দুইভাবে লিখিত হয়

১. স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন—অমর, অনেক।
২. শব্দের মধ্যে অন্য বর্ণের সঙ্গে বিলীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন—কর, বল। এখানে ক এবং র আর ব এবং ল বর্ণের সঙ্গে অ বিলীন হয়ে আছে। (ক + অ + র + অ; ব্ + অ + ল্ + অ)।

শব্দের অ-ধ্বনির দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়

১. বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ। যেমন—অমল, অনেক, কত।
২. সংবৃত বা ও-ধ্বনির মতো উচ্চারণ। যথা—অধীর, অতুল, মন। এ উচ্চারণগুলোতে অ-এর উচ্চারণ অনেকটা ও-এর মতো (ওধীর, ওতুল, মোন)।

১. ‘অ’-ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ

(ক) শব্দের আদিতে

১. শব্দের আদিতে না-বোধক ‘অ’ যেমন—অটল, অনাচার।
২. ‘অ’ কিংবা ‘আ’-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন—অমানিশা, কথা।

(খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসজ্জাতির কারণে বিবৃত ‘অ’। যেমন—কলম, বৈধতা, যত, শ্রেয়ঃ।
২. ঋ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি, ঐ-ধ্বনি এবং ও-ধ্বনির পরবর্তী ‘অ’ প্রায়ই বিবৃত হয়। যেমন—ভৃগ, দেব, ধৈর্য, নোলক, মৌন ইত্যাদি।
৩. অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন—গঠিত, মিত, জনিত ইত্যাদি।

২. অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ

অ-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণে চোয়াল বেশি ফাঁক হয়। ঠোঁট তত বাঁকা বা গোল হয় না। কিন্তু সংবৃত উচ্চারণে চোয়ালের ফাঁক কম ও ঠোঁট গোলাকৃত হয়ে ‘ও’-এর মতো উচ্চারিত হয়। সংবৃত উচ্চারণকে ‘বিকৃত’, ‘অপ্রকৃত’ বা ‘অস্বাভাবিক’ উচ্চারণ বলা ঠিক নয়। সংবৃত উচ্চারণও ‘স্বাভাবিক’, ‘অবিকৃত’ ও ‘প্রকৃত’ উচ্চারণ।

(ক) শব্দের আদিতে

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দের আদি ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন— অতি (ওতি), করুণ (কোরুণ), করে (অসমাপিকা ‘কোরে’)। কিন্তু সমাপিকা ‘করে’ শব্দের ‘অ’ বিবৃত।
২. পরবর্তী ই, উ – ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ববর্তী র-ফলাযুক্ত ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন – প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি। কিন্তু অ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন—প্রভাত, প্রত্যয়, প্রণাম ইত্যাদি।

(খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. তর, তম, তন প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদের অন্ত্য স্বর ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন – প্রিয়তম (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো) ইত্যাদি।
২. ই, উ-এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য ‘অ’ সংবৃত। যেমন – পিয় (পিয়ো), যাবতীয় (যাবতীয়ো) ইত্যাদি।

আ : বাংলায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (calm) শব্দের আ (a)-এর মতো। যেমন— আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি।

বাংলায় একাক্ষর (Monosyllabic) শব্দে আ দীর্ঘ হয়। যেমন— কাজ শব্দের আ দীর্ঘ এবং কাল শব্দের আ হ্রস্ব। এরূপ— যা, পান, ধান, সাজ, চাল, চাঁদ, বাঁশ।

ই ঈ : বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই-ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ-ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ – দুটোই দীর্ঘ হয়। যেমন— বিষ, বিশ, দীন, দিন, শীত।

উ ঊ : বাংলায় উ এবং ঊ ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ই ঈ-ধ্বনির মতো একাক্ষর শব্দে এবং বহু অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের বন্ধাক্ষরে বা প্রান্তিক যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ সামান্য দীর্ঘ হয়। যেমন— চুল (দীর্ঘ), চুলা (হ্রস্ব), ভূত, মুক্ত, তুলতুলে, তুফান, বহু, অজু, করুণ।

ঋ : স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঋ-এর উচ্চারণ রি অথবা রী-এর মতো হয়। আর ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র-ফলা+ ই-কার এর মতো হয়। যেমন— ঋণ, ঋতু, (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষি (ক্রিষ্টি)।

দ্রষ্টব্য : বাংলায় ঋ-ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।

সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাংলা বর্ণমালায় এটি স্বরবর্ণের মধ্যে রক্ষিত হয়েছে।

এ : এ-ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম : সংবৃত ও বিবৃত। যেমন – মেঘ, সংবৃত/বিবৃত, খেলা-(খ্যালা), বিবৃত।

১. সংবৃত

ক) পদের অন্তে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন– পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে, আসে ইত্যাদি।

খ) তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।

গ) একাক্ষর সর্বনাম পদের ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন– কে, সে, যে।

ঘ) ‘হ’ কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন– দেহ, কেহ, কেঁট।

ঙ) ‘ই’ বা ‘উ’-কার পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন – দেখি, রেণু, বেগুন।

২. বিবৃত : ‘এ’ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)-এর ‘এ’ (a)-এর মতো। যেমন– দেখ (দ্যাখ), একা (এয়াকা) ইত্যাদি।

এ- ধ্বনির এই বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

ক) দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে– যেমন : এত, হেন, কেন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম– যেথা, সেথা, হেথা।

খ) অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগের এ-ধ্বনি বিবৃত। যেমন–খেড়়া, চেড়়া, সঁয়াতসঁতে, গঁজেল।

গ) খাঁটি বাংলা শব্দে : যেমন– খেমটা, ঢেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।

ঘ) এক, এগার, তের – এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, ‘এক’ যুক্ত শব্দেও : যেমন– একচোট, একতলা, একঘরে ইত্যাদি।

ঙ) ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়, তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপে; যেমন– দেখ (দ্যাখ), দেখ (দ্যাখো), খেল (খ্যাল), খেল (খ্যালো), ফেল (ফ্যাল), ফেল (ফ্যালো) ইত্যাদি।

ঐ : এ ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + ই কিংবা ও + ই = অই, ওই। অ এবং ই– এ দুটো স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন – ক্ + অ + ই = কই, কৈ; ব্ + ই + ধ = বৈধ ইত্যাদি। এরূপ – বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও : বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কার দীর্ঘ হয়। যেমন– গো, জোর, রোগ, ভোর, কোন, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণত হ্রস্ব হয়। যেমন– সোনা, কারো, পুরোভাগ। ও-এর উচ্চারণ ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)-এর মতো।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

ক-বর্গীয় ধ্বনি : ক খ গ ঘ ঙ—এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাৎ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি।

চ-বর্গীয় ধ্বনি : চ ছ জ ঝ ঞ—এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।

ট-বর্গীয় ধ্বনি : ট ঠ ড ঢ ণ —এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উন্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উন্টা হয় বলে এদের নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। আবার এগুলো ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় মূর্ধন্য ধ্বনি।

ত-বর্গীয় ধ্বনি : ত থ দ ধ ন—এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় দন্ত্য ধ্বনি।

প-বর্গীয় ধ্বনি : প ফ ব ভ ম —এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের ওষ্ঠ্যধ্বনি বলে।

জ্ঞাতব্য

- (১) ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্ণে মোট পঁচিশটি ধ্বনি। এসব ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সঙ্গে অন্য বাগযন্ত্রের কোনো কোনো অংশের কিংবা ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে; অর্থাৎ এদের উচ্চারণে বাক্প্রত্যঞ্জের কোথাও না কোথাও ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাধা পেয়ে বেরিয়ে যায়। বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয় বলে এগুলোকে বলে স্পর্শ ধ্বনি।
- (২) ঙ ঞ ণ ন ম —এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস—তাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় নাসিক্য ধ্বনি এবং প্রতীকী বর্ণগুলোকে বলা হয় নাসিক্য বর্ণ।
- (৩) * চন্দ্রকিন্দু চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এজন্য এটিকে অনুনাসিক ধ্বনি এবং প্রতীকটিকে অনুনাসিক প্রতীক বা বর্ণ বলে। যেমন—আঁকা, চাঁদ, বাঁধ, বাঁকা, শাঁস ইত্যাদি।
- (৪) বাংলায় ঙ এবং ঞ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। যেমন—রঙ / রং, অহংকার / অহঙ্কার ইত্যাদি।
- (৫) ঞ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি অনেকটা ‘ইয়’-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনির মতো। যেমন — ভূঞা (ভুঁইয়া)।
- (৬) চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে থাকলে ঞ-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেমন — জঞ্জাল, খঞ্জ ইত্যাদি।
- (৭) বাংলায় ণ এবং ন-বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি দুটির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে যুক্ত হলে ণ-এর মূর্ধন্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন — ঘণ্টা, লণ্ঠন ইত্যাদি।

(৮) ঙ ৭ ঞ ণ – এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি কখনো শব্দের প্রথমে আসে না, শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে আসে। সুতরাং এসব ধ্বনির প্রতীক বর্ণও শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না, শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন— সঙ্ঘ বা সংঘ, ব্যাঙ বা ব্যাং, অঞ্জনা, ভূঞা, ক্ষণ ইত্যাদি।

(৯) ন-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন জায়গায়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন— নাম, বানান, বন ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

স্পর্শধ্বনি বা বর্ণীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণরীতির দিক থেকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ, অঘোষ ও ঘোষ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Unaspirated)। যেমন—ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated)। যেমন— খ, ঘ ইত্যাদি।

অঘোষ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না। তখন ধ্বনিটির উচ্চারণ গাঙ্গীর্ষহীন ও মৃদু হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি (Unvoiced)। যেমন— ক, খ ইত্যাদি।

ঘোষ ধ্বনি : ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হলে ঘোষ ধ্বনি (Voiced) হয়। যেমন— গ, ঘ ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং অঘোষ ও ঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জন ও নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলোকে নিচের ছকে দেখানো হলো—

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ (Voiceless)		ঘোষ (Voiced)		
	(১) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(২) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৩) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(৪) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৫) নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

অন্তঃস্থ ধ্বনি : স্পর্শ বা উষ্ম ধ্বনির অন্তরে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে য র ল ব-এ ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয় আর বর্ণগুলোকে বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ।

য : য-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি সাধারণত সম্মুখ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। এজন্য এ ধ্বনিটিকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি। শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হলে বাংলায় এর উচ্চারণ ‘জ’-এর মতো। যেমন – যখন, যাবেন, যুদ্ধ, যম ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে বা অন্তে (সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী) ব্যবহৃত হলে ‘য়’ উচ্চারিত হয়। যেমন – বি + যোগ = বিয়োগ।

র : র-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তদ্বারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাথেকে কম্পিত করা হয় বলে এ ধ্বনিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলা হয়। উদাহরণ – রাহাত, আরাম, বাজার ইত্যাদি।

ল : ল-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেয়া হয়। দুই পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। যেমন – লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল।

ব : বাংলা বর্ণমালায় বর্ণীয়-ব এবং অন্তঃস্থ-ব-এর আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নেই। আগে বর্ণীয় ও অন্তঃস্থ-এ দুই রকমের ব-এর লেখার আকৃতিও পৃথক ছিল, উচ্চারণও আলাদা ছিল। এখন আকৃতি ও উচ্চারণ অভিনু বলে অন্তঃস্থ-ব কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তঃস্থ ‘য’ ও অন্তঃস্থ ‘ব’-এ দুটো অর্ধস্বর (Semivowel)। প্রথমটি অয় বা ইয় (y) এবং দ্বিতীয়টি অব বা অও (w)-র মতো। যেমন – নেওয়া, হওয়া ইত্যাদি।

উষ্মধ্বনি : যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শিশ্বধ্বনির সৃষ্টি করে, সেটি উষ্মধ্বনি। যেমন– আশীষ, শিশি, শিশু ইত্যাদি। শিশ দেয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে বলে একে শিশ্বধ্বনিও বলা হয়।

শ, ষ, স – তিনটি উষ্ম বর্ণ। শ-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান পশ্চাৎ দন্তমূল। ষ-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান মূর্ধা এবং স-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান দন্ত।

লক্ষণীয় : স-এর সঙ্গে খ র ত থ কিংবা ন যুক্ত হলে স-এর দন্ত্য উচ্চারণ হয়। যেমন – স্থলন, স্রষ্টা, আস্ত, স্থাপন, স্নেহ ইত্যাদি। আবার বানানে (লেখায়) শ থাকলেও উচ্চারণ দন্ত্য-স হয়। যেমন – শ্রমিক (স্রমিক), শৃঙ্খল (সৃঙ্খল), প্রশ্ন (প্রস্ন)।

অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্যধ্বনি (ট ও ঠ)–এর আগে এলে স-এর উচ্চারণ মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন– কষ্ট, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

হ : হ-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনিটি কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন মূল উষ্ম ঘোষধ্বনি। এ উষ্মধ্বনিটি উচ্চারণের সময় উন্মুক্ত কণ্ঠের মধ্য দিয়ে বাতাস জোরে নির্গত হয়। যেমন – হাত, মহা, পহেলা ইত্যাদি।

ং (অনুস্বার) : ং এর উচ্চারণ ঙ –এর উচ্চারণের মতো। যেমন – রং (রঙ), বাংলা (বাঙলা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিনু হয়ে যাওয়ায় ং-এর বদলে ঙ এবং ঙ-এর বদলে ং-এর ব্যবহার খুবই সাধারণ।

ঃ (বিসর্গ) : বিসর্গ হলো অঘোষ ‘হ’-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। হ-এর উচ্চারণ ঘোষ, কিন্তু ঃ এর উচ্চারণ অঘোষ। বাংলায় একমাত্র বিস্ময়াদি প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়। যথা— আঃ, উঃ, ওঃ, বাঃ ইত্যাদি। সাধারণত বাংলায় শব্দের অন্তে বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। যেমন — বিশেষতঃ (বিশেষত), ফলতঃ (ফলত)। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন — দুঃখ (দুখখ), প্রাতঃকাল (প্রাতক্কাল)।

ড় ও ঢ় : ড় ও ঢ়-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্থাৎ উল্টো পিঠের দ্বারা ওপরের দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় তাড়নজাত ধ্বনি। ড়-এর উচ্চারণ ড এবং র-এর দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের মাঝামাঝি এবং ঢ়-এর উচ্চারণ ড় এবং হ-এর দ্বারা দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের দ্রুত মিলিত ধ্বনি। যেমন — বড়, গাঢ়, রাঢ়, ইত্যাদি।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

দুটি বা তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি বা ধ্বনি কয়টি একত্রে উচ্চারিত হয়। এরূপ যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির দ্যোতনার জন্য দুটি বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ (ligature) গঠিত হয়। সাধারণত এরূপে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মূল বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন — তক্তা (ত্ + অ + ক্ + ত্ + আ = তক্তা)। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ ক ও ত-এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে ক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধারণত তিনভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হতে পারে। যথা :

ক. কার সহযোগে

খ. ফলা সহযোগে

গ. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ (ফলা ব্যতীত) সহযোগে।

ক. কার সহযোগে : স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে ‘কার’। অ-ভিন্ন অন্য দশটি স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। সুতরাং বাংলায় কার দশটি। এগুলো যথাক্রমে :

আ-কার (।) – বাবা, মা, চাকা;

ঋ-কার (◌) কৃতী, গৃহ, ঘৃত;

ই-কার (ি) – পাখি, বাড়ি, চিনি;

এ-কার (ে) ছেলে, মেয়ে, ধৈর্য;

ঈ-কার (ী) – নীতি, শীত, স্ত্রী;

ঐ-কার (ে) বৈশাখ, চৈত্র, ধৈর্য;

উ-কার (ু) – খুকু, বুবু, ফুফু;

ও-কার (ে) দোলা, তোতা, খোকা;

ঊ-কার (ূ) – মূল্য, চূর্ণ, পূজা;

ঔ-কার (ৌ) পৌষ, গৌতম, কৌতুক।

খ.১. ফলা সহযোগে : ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। ফলা যুক্ত হলে বর্ণের আকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা ছয়টি। যেমন—

ণ/ ন-ফলা (ণ/ন) – চিহ্ন, রত্ন, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন, বিষু, কৃষ্ণ। চিহ্ন-র ণ এবং কৃষ্ণ-র ণ

ব- ফলা (ব) – বিশ্বাস, নিঃস্ব, নিতম্ব।

ম- ফলা (ম)- তন্ময়, পদ্ম, আত্মা।

য- ফলা (য) - সহ্য, অত্যন্ত, বিদ্যা।

র- ফলা (ৱ)- গ্রহ, ব্রত, স্রষ্টা।

(ৱেফ) - বর্ণ, স্বর্ণ, তর্ক, খর্ব।

ল- ফলা (ল)- ক্লাস্ত, অম্লান, উল্লাস।

খ. ২. বাংলা স্বরবর্ণের সঙ্গেও ফলা যুক্ত হয়। যথা- এ্যাপোলো, এ্যার্টম, এ্যার্টনি, অ্যালার্ম ধ্বনি ইত্যাদি।

খ. ৩. বাংলা যুক্ত ব্যঞ্জননের সাথেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন - সন্ধ্যাস, সূক্ষ্ম, বুদ্ধিগী, সন্ধ্যা, ইত্যাদি।

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ।

দুই বর্ণের যুক্ত:

ক্ক = ক্+ক। যেমন- পাক্কা, ছক্কা, চক্কর।

ক্ত্ত = ক্+ত। যেমন- রক্ত্ত, শক্ত্ত, ভক্ত্ত।

ক্ষ = ক্+ষ। (উচ্চারণ ক্+খ-এর মতো) যেমন- শিক্ষা, বক্ষ, রক্ষা।

ক্স = ক্+স। বাক্স।

ক্ক = ক্+ক। যেমন- অক্ক, কক্কাল, লক্ক।

ক্ক = ক্+খ। যেমন- শৃক্কলা, শক্ক।

ক্ক = ক্+গ। যেমন- অক্ক, মক্কাল, সজ্জীত।

ক্ক = ক্+ঘ। যেমন- সজ্জ, লজ্জন।

ক্ক = ক্+চ। যেমন- উক্ক, উচ্চারণ, উচ্চকিত।

ক্ক = ক্+ছ। যেমন- উচ্ছল, উচ্ছল, উচ্ছদ।

ক্ক = ক্+জ। যেমন- উজ্জীবন, উজ্জীবিত।

ক্ক = ক্+ঝ। যেমন- কুজ্জটিকা।

ক্ক = ক্+ঞ। যেমন- উচ্চারণ 'গুণ্য'- এর মতো) যেমন- জ্ঞান, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান।

ক্ক (ক্ক) = ক্+চ। যেমন- অক্কল, সক্কয়, পক্কম।

ক্ক = ক্+ছ। যেমন-বাক্কিত, বাক্কনীয়, বাক্ক।

ক্ক = ক্+জ। যেমন- গক্ক, রক্কন, কুজ্জ।

ক্ক = ক্+ঝ। যেমন- বাক্ক, বাক্কট।

[বি. দ্র. উপর্যুক্ত চারটি সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ 'ন' হলে ও লেখার সময় কখনো ন্চ (অন্চল), ন্ ছ (বান্ছা), ন্জ (গন্জ), নঝ (বান্ঝা) রূপে লেখা ঠিক নয়।]

ট = ট্ + ট। যেমন- অটালিকা, চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম।

ডড = ড্ + ড। যেমন- গড্ডালিকা, উড্ডীন, উড্ডয়ন।

ণ্ট = ণ্ + ট। যেমন- ঘণ্টা, বণ্টন।

স্ত = ত্ + ত। যেমন- উস্তম, বিস্ত, চিস্ত।

থ = ত্ + থ। যেমন- উথান, উথিত, অভুথান।

দ = দ্ + দ। যেমন- উদাম, উদ্দীপক, উদ্দেশ্য।

দ্ব = দ্ + ধ। যেমন- উদ্বত, উদ্বৃত, পদ্বতি।

ড্ব = দ্ + ভ। যেমন- উড্বব, উড্বট, উড্বিদ।

স্ত = ন্ + ত। যেমন- অন্ত, দন্ত, কান্ত।

ন্দ = ন্ + দ। যেমন- আনন্দ, সন্দেহ, বন্দী।

ন্ব = ন্ + ধ। যেমন- বন্দন, রন্দন, সন্দান।

ন্ন = ন্ + ন। যেমন- অন্ন, হিন্ন, ভিন্ন।

ন্ম = ন্ + ম। যেমন- জন্ম, আজন্ম।

প্ত = প্ + ত। যেমন- রপ্ত, ব্যাপ্ত, লিপ্ত।

প্প = প্ + প। যেমন- পাপ্পা, পাপ্পু, ধাপ্পা।

প্স = প্ + স। যেমন- লিপ্সা, অভীপ্সা।

ব্দ = ব্ + দ। যেমন- অব্দ, জব্দ, শব্দ।

ব্ধ = ব্ + ক। যেমন- উব্ধা, বব্ধল।

ব্ল = ব্ + গ। যেমন- ফাল্লুন।

ল্ট = ল্ + ট। যেমন- উল্টা।

ষক = ষ্ + ক। যেমন- শুষক, পরিষ্কার, বহিষ্কার।

স্ক = স্ + ক। যেমন- স্কুল, স্কন্ধ।

স্ব্থ = স্ + থ। যেমন- স্ব্থলন।

স্ট = স্ + ট। যেমন- আগস্ট, স্টেশন।

সত = স্ + ত। যেমন- অসত, সসতা, সত্ব।

স্প = স্ + প। যেমন- স্পষ্ট, স্পন্দন, স্পর্ধা।

স্ফ = স্ + ফ। যেমন- স্ফটিক, প্রস্ফুটিত।

ব্ধ = হ্ + ম। যেমন- ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ।

এছাড়া বাংলা ভাষায় দুইয়ের অধিক বর্ণ সংযোগেও কিছু সংযুক্ত বর্ণ গঠিত হয়। সূক্ষ্ম শব্দে ক্ষ্ম বর্ণ = ক্ + ষ + ম - ফলা ; স্বাতন্ত্র্য শব্দের ত্র্য = ন + ত + র - ফলা (২) + য - ফলা (১) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ধ্বনির পরিবর্তন

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

১. আদি স্বরাগম (Prothesis) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগম (Prothesis)। যেমন – স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন। এরূপ – আস্তাবল, আস্পর্ধা।

২. মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন–

অ – রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি।

ই – প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।

উ – মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভূ > ভুরু ইত্যাদি।

এ – গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।

ও – শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।

৩. অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis) : কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম। যেমন – দিশ্ > দিশা, পোখত্ > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সতিয় ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিতি (Apenthesis) : পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন – আজি > আইজ, সাধু > সাউধ, রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর ইত্যাদি।

৫. অসমীকরণ (Dissimilation) : একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন – ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ ইত্যাদি।

৬. স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony) : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন – দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো ইত্যাদি।

ক. প্রগত (Progressive) : আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন – মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

খ. পরাগত (Regressive) : অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন– আখো > আখুয়া > এখো, দেশি > দিশি।

গ. **মধ্যগত (Mutual)** : আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসজ্জাতি হয়। যেমন— বিলাতি > বিলিতি।

ঘ. **অন্যোন্য় (Reciprocal)** : আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য় স্বরসজ্জাতি হয়। যেমন— মোজা > মুজো।

ঙ. **চলিত বাংলায় স্বরসজ্জাতি** : গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর ও-কার হয়। যেমন— মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে—উড়নি > উড়নি, এখনি > এখুনি হয়।

৭. **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ** : দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন— বসতি > বস্তি, জানালা > জান্লা ইত্যাদি।

ক. **আদিস্বরলোপ (Aphesis)** : যেমন— অলাবু > লাবু > লাউ, উন্মহার > উমহার > ধার।

খ. **মধ্যস্বর লোপ (Syncope)** : অগুরু > অগু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

গ. **অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope)** : আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার (বাংলা), সম্ভা > সম্ভা > সাঁঝ। (স্বরলোপ বস্তুত স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া।)

৮. **ধ্বনি বিপর্যয়** : শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জননের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন— ইংরেজি বাক্স > বাংলা বাস্ক, জাপানি রিক্সা > বাংলা রিস্কা ইত্যাদি। অনুরূপ— পিচাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল।

৯. **সমীভবন (Assimilation)** : শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমন— জন্ম > জন্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

ক. **প্রগত (Progressive) সমীভবন** : পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীভবন। যেমন— চক্র > চক্ক, পক্ক > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্গ ইত্যাদি।

খ. **পরাগত (Regressive) সমীভবন** : পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একে বলে পরাগত সমীভবন। যেমন— তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তন্দিহিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ ইত্যাদি।

গ. **অন্যোন্য় (Mutual) সমীভবন** : যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে অন্যোন্য় সমীভবন। যেমন— সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ। সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

১০. **বিষমীভবন (Dissimilation)** : দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন— শরীর > শরীল, লাল > নালা ইত্যাদি।

১১. **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long Consonant) বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব** : কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব। যেমন— পাকা > পাক্কা, সকাল > সঙ্কাল ইত্যাদি।

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতি : শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন – কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১৩. ব্যঞ্জনচ্যুতি : পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি। যেমন – বউদিদি > বউদি, বড় দাদা > বড়দা ইত্যাদি।

১৪. অন্তর্হতি : পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন – ফাল্লুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি।

১৫. অভিযুতি (Umlaut) : বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিযুতি। যেমন – করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে ‘কইরিয়া’ কিংবা বিপর্যয়ের ফলে ‘কইরা’ থেকে অভিযুতিজাত ‘করে’। এরূপ – শূনিয়া > শূনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো ইত্যাদি।

১৬. র-কার লোপ : আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন – তর্ক > তর্ক, করতে > কন্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কললাম।

১৭. হ-কার লোপ : আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন – পুরোহিত > পুরুত, গাইল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আরবি আল্লাহ > বাংলা আল্লা, ফারসি শাহ > বাংলা শা ইত্যাদি।

য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি (Euphonic glides) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর (যৌগিক স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ ‘য়’ (Y) বা অন্তঃস্থ ‘ব’ (W) উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যেমন – মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) যা = যাওয়া। এরূপ – নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। ধ্বনি ও বর্ণের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণসহযোগে এদের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
- ২। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?
- ৩। দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর কাকে বলে? উদাহরণসহ বাংলা যৌগিক স্বরগুলোর গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ৪। উদাহরণসহ নিচের বর্ণগুলোর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

ঙ, ঞ, ণ, ন, শ, ষ, স, ৎ, ৳, ঢ।

৫। নিচের শব্দগুলোর ঠিক উচ্চারণ পাশে লিখে দাও।

দ্বিতীয়, আত্মীয়, অবজ্ঞা, বিশ্ব, বিজ্ঞয়, সত্য, সহ্য।

(নমুনা : ঝঞ্ঝা – ঝনঝা, কণ্টক – কণটক)।

৬। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও : সমীভবন, বিপ্রকর্ষ, স্বরসজ্জাতি, অন্তর্হতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি।

৭। ধ্বনি পরিবর্তনের যে যে বিধানে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ গঠিত হয়েছে, তা পাশাপাশি লিখে দাও।

কপাট, জেলে, বৌদি, আলাদা।

৮। বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক সূত্রটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

(অপিনিহিতি, ধ্বনি-বিপর্যয়, স্বরধ্বনি লোপ, স্বরাগম, অভিশ্রুতি, স্বরসজ্জাতি, অসমীকরণ, বর্ণদ্বিতা)

(ক) একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য ‘আ’ যুক্ত হলে তাকে বলে.....।

(খ) শব্দের মধ্যে ই বা উ যথাস্থানের আগে উচ্চারিত হলে তাকে.....বলে।

(গ) শব্দের মধ্যে দুটি সমধ্বনির একটি লোপ হলে তাকে বলে.....।

(ঘ) জোর দেয়ার জন্য যখন শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় তখন তাকে.....বলা হয়।

(ঙ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে.....বলে।

৯। নিচের বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির নাম ডান পার্শ্বে লেখ (যেমন – ঘোষ, মহাপ্রাণ, কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন)।

ব, শ, ম, দ, খ, প, ঠ, হ, ক্ষ

১০। ঠিক উত্তরে টিক (✓) দাও।

ট – কণ্ঠ্যবর্ণ, ম – ওষ্ঠ্যবর্ণ, গ – ঘোষবর্ণ, চ – দন্ত্যবর্ণ, ঘ – অল্পপ্রাণ কণ্ঠ্যবর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ গত্ব ও যত্ব বিধান

১. গত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-গ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-গ এবং দন্ত্য-ন-এর ব্যবহার আছে। তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে গ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই গত্ব বিধান।

গ ব্যবহারের নিয়ম

১. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য 'গ' যুক্ত হয়। যেমন— ঘণ্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।
 ২. ঞ, র, ষ - এর পরে মূর্ধন্য 'গ' হয়। যেমন— ঞ্গণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারণ, মরণ, ব্যাকরণ, ভীষণ, ভাষণ, উষ্ণ ইত্যাদি।
 ৩. ঞ, র, ষ-এর পরে স্বরধ্বনি, য য় ব হ ং এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য 'গ' হয়। যেমন— কৃপণ (ঞ-কারের পরে প্, তার পরে গ), হরিণ (র-এর পরে ই, তার পরে গ, অর্পণ (র্ + প্ + অ+গ), লক্ষণ (ক্ + ষ্ + অ + গ)। এরূপ— রুক্ষিণী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।
৪. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই গ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ	বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ গণিকা।	
কল্যাণ শোণিত মণি	স্বাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।	
আপণ লাভণ্য বাণী	নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।	
চিকণ নিকণ তূণ	কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।	

সমাসবন্ধ শব্দে সাধারণত গ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে ন হয়। যেমন— ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক। ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো গ হয় না, ন হয়। যেমন— অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

২. ষ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ষ-এর প্রয়োগ রয়েছে। যে-সব তৎসম শব্দে ‘ষ’ রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত আছে। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য ‘ষ’-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ব বিধান বলে।

ষ ব্যবহারের নিয়ম

১. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন- ভবিষ্যৎ (ভ্ + অ + ব্ + ই +) এখানে ব-এর পরে ই-এর ব্যবধান), মুমূর্ষু, চক্ষুন্মান, চিকীর্ষা ইত্যাদি।
২. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে ‘ষ’ হয়। যেমন – অভিসেক > অভিষেক, সুসুপ্ত > সুশুপ্ত, অনুসজ্জা > অনুষজ্জা, প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান, অনুস্থান > অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি।
৩. ‘ঋ’ কারের পর ‘ষ’ হয়। যেমন- ঋষি, কৃষক, উৎকৃষ্ট, দৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি।
৪. তৎসম শব্দে ‘র’-এর পর ‘ষ’ হয়। যেমন- বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ।
৫. র- ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে ‘ষ’ হয়। যথা : পরিষ্কার। কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যথা পুরস্কার।
৬. ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে ‘ষ’ যুক্ত হয়। যথা : কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ ইত্যাদি।
৭. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই ‘ষ’ হয়। যেমন-ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, উষা, পৌষ, কলুষ, পাষণ, মানুষ, ঔষধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, দ্বেষ ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে ষ হয় না। এ সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। যেমন- জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত ‘সাৎ’ প্রত্যয়যুক্ত পদেও ষ হয় না। যেমন- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। গত্ব বিধান ও যত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।
- ২। সমাসবন্ধ পদে গত্ব বিধানের নিয়ম খাটে না, এমন পাঁচটি উদাহরণ দাও।
- ৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :
 - (ক) ট, ঠ, ড এবং ঢ বর্ণের পূর্বে ‘ন’ যুক্ত হলে সর্বদাই ণ হয়।
যেমন.....(৫টি)
 - (খ) অ, আ তিন স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।
যেমন.....(৫টি)
 - (গ) বিদেশি ও দেশি শব্দের বানানে ষ হয় না।
যেমন.....(৫টি)
- ৪। নিচের শব্দগুলো শুদ্ধ করে লেখ :
লবন, নশ্ট, পুরস্কার, সুসম, আনুসঙ্গিক, ফেশন, পোষাক, জার্মাণ, কুরআণ, দুর্গাম।
- ৫। যে বানানটি ঠিক তার নিচে দাগ দাও :

(ক) কৃপণ, তুন, ঘন্টা, বর্ণ, হরিন, লাবণ্য, কনিকা, বণিক, কৃশক, উৎকৃষ্ট, কাষ্ঠ, শুম্মা, অনুসজ্জা, বিষ্ণ, সরিষা, পোষ্ট।	(খ) আষার / আষাঢ় / আশাড় পাশান্ড / পাষন্ড, পাসন্ড তোষণ / তোশন / তোসণ প্রতিষ্ঠান / প্রতিষ্ঠাণ / প্রতিষ্ঠান মিলন / মিলণ	কণিকা / কনিকা লবণ / লবন দর্পন / দর্পণ কল্যাণ / কল্যান গুণী / গুনী
---	---	---

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সন্ধি

সংজ্ঞা

সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। যেমন— আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (।) এবং দ্বিতীয়টিতে অ + আ = আ (।) হয়েছে। আবার, তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে, এখানে ত + ম = ন্ম হয়েছে।

সন্ধির উদ্দেশ্য

(ক) সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং (খ) ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন। যেমন— ‘আশা’ ও ‘অতীত’ উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, ‘আশাতীত’ তার চেয়ে অল্প আয়াসে উচ্চারিত হয়। সেরূপ ‘হিম আলয়’ বলতে যে রূপ শোনা যায়, ‘হিমালয়’ তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত এবং শ্রুতিমধুর। তাই যে ক্ষেত্রে আয়াসের লাঘব হয় কিন্তু ধ্বনি-মাধুর্য রক্ষিত হয় না, সে ক্ষেত্রে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন— কচু + আদা + আলু = কচাদালু হয় না। অথবা কচু + আলু + আদা = কচাআদা হয় না।

আমরা প্রথমে খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি ও পরে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করব। উল্লেখ্য, তৎসম সন্ধি মূলত বর্ণ সংযোগের নিয়ম।

বাংলা শব্দের সন্ধি

বাংলা সন্ধি দুই রকমের : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

১. স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে।

১. সন্ধিতে দুটি সন্নিহিত স্বরের একটির লোপ হয়। যেমন—

(ক) অ + এ = এ (অ লোপ), যেমন – শত + এক = শতেক। এরূপ – কতেক।

(খ) আ + আ = আ (একটি আ লোপ)। যেমন – শাঁখা + আরি = শাঁখারি। এরূপ – রূপা + আলি = রূপালি।

(গ) আ + উ = উ (আ লোপ)। যেমন – মিথ্যা + উক = মিথ্যুক। এরূপ – হিন্দুক, নিন্দুক ইত্যাদি।

(ঘ) ই + এ = ই (এ লোপ)। যেমন – কুড়ি + এক = কুড়িক। এরূপ – ধনিক, গুটিক ইত্যাদি।

আশি + এর = আশির (এ লোপ)। এরূপ – নদীর (নদী + এর)।

২. কোনো কোনো স্থলে পাশাপাশি দুটি স্বরের শেষেরটি লোপ পায়। যেমন – যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই।

এখানে (আ+ই) এর মধ্যে ই লোপ পেয়েছে।

২। ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সমীভবন (Assimilation)-এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্যরীতিতে সীমাবদ্ধ।

১. প্রথম ধ্বনি অঘোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটি মিলে ঘোষ ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ সন্ধিতে ঘোষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনিও ঘোষ হয়। যেমন – ছোট + দা = ছোড়দা।
২. হলন্ত র্ (বন্ধ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে র্ লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। যেমন– আর + না = আনা, চার + টি = চাট্টি, ধর্ + না = ধনা, দুর্ + ছাই = দুছাই ইত্যাদি।
৩. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত-বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত-বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ-বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ ত-বর্গীয় ধ্বনি ও চ-বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দ্বিত্ব হয়। যেমন– নাত + জামাই = নাজ্জামাই (ত্ + জ্ = জ্জ), বদ + জাত = বজ্জাত, হাত + ছানি = হাচ্ছানি ইত্যাদি।
৪. ‘প’-এর পরে ‘চ’ এবং ‘স’-এর পরে ‘ত’ এলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়। যেমন – পাঁচ + শ = পাঁশ্শ। সাত + শ = সাশ্শ, পাঁচ + সিকা = পাঁশ্শিকা।
৫. হলন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না। যেমন – বোন + আই = বোনাই, চুন + আরি = চুনারি, তিল + এক = তিলেক, বার + এক = বারেক, তিন + এক = তিনেক।
৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন – কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, নাতি + বৌ = নাতিবৌ, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের সন্ধি

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব শব্দই তৎসম (তৎ = তার + সম = সমান)। তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণির শব্দের সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার : (১) স্বরসন্ধি (২) ব্যঞ্জন সন্ধি (৩) বিসর্গ সন্ধি।

১. স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + অ = আ নর + অধম = নরাধম। এরূপ-হিমাচল, প্রাণাধিক, হস্তান্তর, হিতাহিত ইত্যাদি।

অ + আ = আ হিম + আলয় = হিমালয়। এরূপ - দেবালয়, রত্নাকর, সিংহাসন ইত্যাদি।

আ + অ = আ যথা + অর্থ = যথার্থ। এরূপ – আশাতীত, কথামৃত, মহার্ঘ ইত্যাদি।

আ + আ = আ বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়। এরূপ- কারাগার, মহাশয়, সদানন্দ ইত্যাদি।

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + ই = এ শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা।

আ + ই = এ যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।

অ + ঈ = এ পরম + ঈশ = পরমেশ।

আ + ঈ = এ মহা + ঈশ = মহেশ।

এরূপ —পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি।

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + উ = ও সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়।

আ + উ = ও যথা + উচিত = যথোচিত।

অ + ঊ = ও গৃহ + উর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব।

আ + ঊ = ও গজা + উর্মি = গজোর্মি।

এরূপ —নীলোৎপল, চলোর্মি, মহোৎসব, নবোঢ়া, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘অর্’ হয় এবং তা রেফ (’) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন—

অ + ঋ = অর্ দেব + ঋষি = দেবর্ষি।

আ + ঋ = অর্ মহা + ঋষি = মহর্ষি।

এরূপ —অধর্ম, উত্তমর্ম, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি ইত্যাদি।

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ‘ঋত’-শব্দ থাকলে (অ, আ+ঋ) উভয় মিলে ‘আর্’ হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন—

অ + ঋ = আর্ শীত + ঋত = শীতার্ভ।

আ + ঋ = আর্ তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ভ।

এরূপ —ভয়ার্ভ, ক্ষুধার্ভ ইত্যাদি।

৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়; ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জননের সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + এ = ঐ জন + এক = জনৈক।

আ + এ = ঐ সদা + এব = সদৈব।

অ + ঐ = ঐ মত + ঐক্য = মতৈক্য।

আ + ঐ = ঐ মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

এরূপ— হিতৈষী, সর্বৈব, অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি।

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়; ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + ও = ঔ বন + ওষধি = বনৌষধি।

আ + ও = ঔ মহা + ওষধি = মহৌষধি।

অ + ঔ = ঔ পরম + ঔষধ = পরমৌষধ।

আ + ঔ = ঔ মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

ই + ই = ঈ অতি + ইত = অতীত

ই + ঈ = ঈ পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।

ঈ + ই = ঈ সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র।

ঈ + ঈ = ঈ সতী + ঈশ = সতীশ।

এরূপ— গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ, মহীন্দ্র, শ্রীশ, পৃথ্বীশ, অতীব, প্রতীক্ষা, প্রতীত, রবীন্দ্র, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি।

৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে ‘য’ বা য(্য) ফলা হয়। য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়। যেমন—

ই + অ = য্ + অ অতি + অন্ত = অত্যন্ত।

ই + আ = য্ + আ ইতি + আদি = ইত্যাদি।

ই + উ = য্ + উ অতি + উক্তি = অতুক্তি।

ই + ঊ = য্ + ঊ প্রতি + ঊষ = প্রতুষ।

ঈ + আ = য্ + আ মসী + আধার = মস্যাদার।

ই + এ = য্ + এ প্রতি + এক = প্রত্যেক।

ঈ + অ = য্ + অ নদী + অম্বু = নদ্যম্বু।

এরূপ—প্রত্যহ, অত্যধিক, গতান্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যন্ত, যদ্যপি, অভ্যুত্থান, অত্যাশ্চর্য, প্রতুপকার ইত্যাদি।

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়; ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

উ + উ = ঊ মরু + উদ্যান = মরুদ্যান।

উ + ঊ = ঊ বহু + উর্ধ্ব = বহুর্ধ্ব।

ঊ + উ = ঊ বধু + উৎসব = বধুৎসব।

ঊ + ঊ = ঊ ভূ + উর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

১১. উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-কার ও উ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে উ বা উ স্থানে ব-ফলা হয় এবং লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন—

উ + অ = ব + অ	সু + অল্প = স্বল্প।
উ + আ = ব + আ	সু + আগত = স্বাগত।
উ + ই = ব + ই	অনু + ইত = অন্বিত।
উ + ঈ = ব + ঈ	তনু + ঈ = তন্বী।
উ + এ = ব + এ	অনু + এষণ = অন্বেষণ।

এরূপ— পশ্চদম, পশ্চাচার, অন্বয়, মন্বন্তর ইত্যাদি।

১২. ঋ-কারের পর ঋ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ‘ঋ’ স্থানে ‘র’ হয় এবং তা র-ফলা রূপে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন - পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ।

১৩. এ, ঐ, ও, ঔ-কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব্ ও আব্ হয়। যেমন—

এ + অ = অয় + অ	নে + অন = নয়ন। শে + অন = শয়ন।
ঐ + অ = আয় + অ	নৈ + অক = নায়ক। গৈ + অক = গায়ক।
ও + অ = অব্ + অ	পৌ + অন = পবন। লৌ + অন = লবণ।
ঔ + অ = আব্ + অ	পৌ + অক = পাবক।
ও + আ = অব্ + আ	গৌ + আদি = গবাদি।
ও + এ = অব্ + এ	গৌ + এষণা = গবেষণা।
ও + ই = অব্ + ই	পৌ + ইত্র = পবিত্র।
ঔ + ই = আব্ + ই	নৌ + ইক = নাবিক।
ঔ + উ = আব্ + উ	ভৌ + উক = ভাবুক।

১৪. কতগুলো সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ বলে। যথা - কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়), গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবাক্ষ নয়), প্র + উড় = প্রৌড় (প্রোড় নয়), অন্য + অন্য = অন্যান্য, মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, শূদ্র + ওদন = শূদ্রোদন।

২. ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। এদিক থেকে ব্যঞ্জন সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি ২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি ৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

ক, চ, ট, ত্, প্-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্ (ড়্), দ্, ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—

ক্ + অ = গ	দিচ্ + অন্ত = দিগন্ত।
চ্ + অ = জ	গিচ্ + অন্ত = গিজন্ত।
ট্ + আ = ড্	ষট্ + আনন = ষড়ানন।
ত্ + অ = দ	তৎ + অবধি = তদবধি।
প্ + অ = ব	সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

এরূপ- বাগীশ, তদন্ত, বাগাড়ম্বর, কদন্ত, সদানন্দ, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিস্র ইত্যাদি।

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির পর হ্ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিত্ব (চ্ছ) হয়। যথা—

অ + হ্ = চ্ছ	এক + ছত্র = একচ্ছত্র।
আ + হ্ = চ্ছ	কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।
ই + হ্ = চ্ছ	পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।

এরূপ — মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন, অজ্ঞাচ্ছেদ, আলোকচ্ছটা, প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষচ্ছায়া, স্বচ্ছন্দে, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

(ক) ১. ত্ ও দ্-এর পর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন—

ত্ + চ্ = চ্চ	সৎ + চিত্তা = সচ্চিত্তা।
ত্ + হ্ = চ্ছ	উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
দ্ + চ্ = চ্চ	বিপদ + চয় = বিপচ্চয়।
দ্ + হ্ = চ্ছ	বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

এরূপ — উচ্চারণ, শরচ্চন্দ্র, সচ্চরিত্র, তচ্ছবি ইত্যাদি।

২. ত্ ও দ্-এরপর জ্ ও ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থানে জ্ হয়। যেমন—

ত্ + জ্ = জ্জ	সৎ + জন = সজ্জন।
দ্ + জ্ = জ্জ	বিপদ + জাল = বিপজ্জাল।
ত্ + ঝ্ = জ্ঝ	কুৎ + ঝটিকা = কুজ্জটিকা।

এরূপ — উজ্জ্বল, তজ্জন্য, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি।

৩. ত্ ও দ্-এরপর শ্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থলে চ্ এবং শ্-এর স্থলে ছ্ উচ্চারিত হয়। যেমন—

ত্ + শ্ = চ্ + ছ্ = চ্ছ উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস

এরূপ — চলচ্ছক্তি, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি।

৪. ত্ ও দ্-এর পর ড্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে ড় হয়। যেমন—

ত্ + ড্ = ড় উৎ + ডীন = উড়ুডীন।

এরূপ — বৃহড্‌ঢ়কা।

৫. ত্ ও দ্ এর পর হ্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থলে দ্ এবং হ্ এর স্থলে ধ্ হয়। যেমন—

ত্ + হ্ = দ্ + ধ্ = দ্ধ উৎ + হার = উদ্দহার।

দ্ + হ্ = দ্ + ধ্ = দ্ধ পদ্ + হতি = পদ্দতি।

এরূপ — উদ্দত, উদ্দত, তদ্দিত ইত্যাদি।

৬. ত্ ও দ্ এর পর ল্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থলে ল্ উচ্চারিত হয়। যেমন—

ত্ + ল্ = ল্ল উৎ + লাস = উল্লাস।

এরূপ — উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লঙ্ঘন ইত্যাদি।

(খ) ১. ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোনো বর্ণের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোনো বর্ণের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি, (য > জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ ধ্বনি (ব), ঘোষ কাম্পনজাত দন্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা :

ক্ + দ = গ্ + দ বাক্ + দান = বাগদান।

ট্ + য = ড্ + য ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র।

ত্ + ঘ = দ্ + ঘ উৎ + ঘাটন = উদ্‌ঘাটন।

ত্ + য = দ্ + য উৎ + যোগ = উদ্যোগ।

ত্ + ব = দ্ + ব উৎ + বন্ধন = উদ্‌বন্ধন।

ত্ + র = দ্ + র তৎ + রূপ = তদ্রূপ।

এরূপ — দিগ্বিজয়, উদ্যম, উদ্‌গার, উদ্‌গিরণ, উদ্ভব, বাগ্‌জাল, সদ্‌গুরু, বাগ্‌দেবী ইত্যাদি।

২. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি সেই বর্ণীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি কিংবা নাসিক্যধ্বনি হয়। যথা :

ক্ + ন = গঙ + ন দিক্ + নির্ণয় = দিগ্‌নির্ণয় বা দিঙ্‌নির্ণয়।

ত্ + ম = দ্‌/ন + ম তৎ + মধ্য = তদ্‌মধ্য বা তন্মধ্য।

৩. অ ও আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ, বর্ণীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনি কিংবা য, র, ল, ব, হ-এর সম্বন্ধ হলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন—

নিঃ + আকার = নিরাকার, আশীঃ + বাদ = আশীবাদ, দুঃ + যোগ = দুর্যোগ ইত্যাদি।

এরূপ — নিরাকরণ, জ্যোতির্ময়, প্রাদুর্ভাব, নির্জন, বহির্গত, দুর্লভ, দুরন্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র' এর সম্বন্ধ হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী ব্রহ্ম স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন — নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।

৪. বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গ স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়। যেমন—

ঃ + চ / ছ = শ + চ / ছ

নিঃ + চয় = নিশ্চয়, শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ।

ঃ + ট / ঠ = ষ + ট / ঠ

ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুটঙ্কার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।

ঃ + ত / থ = স + ত / থ

দুঃ + তর = দূতর, দুঃ + থ = দূথ।

৫. অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (ক, খ, প, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন—

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = স্ + ক

নমঃ + কার = নমস্কার।

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + খ = স্ + খ

পদঃ + খলন = পদস্খলন।

ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক

নিঃ + কর = নিষকর।

উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক

দুঃ + কর = দূষকর।

এরূপ — পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুষ্পদ, নিষ্ফল, নিষ্পাপ, দুষ্প্রাপ্য, বহিষ্কৃত, দুষ্কৃতি, আবিষ্কার, চতুষ্কেপ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি।

৬. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্বন্ধের বিসর্গ লোপ হয় না। যেমন—

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, মনঃ + কন্ঠ = মনঃকন্ঠ, শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।

৭. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্ম কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন—

নিঃ + স্তম্ভ = নিঃস্তম্ভ কিংবা নিস্তম্ভ। দুঃ + স্ম = দুঃস্ম কিংবা দূস্ম। নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ।

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সম্বন্ধের উদাহরণ

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি, ভাঃ + কর = ভাস্কর, অহঃ + নিশ = অহর্নিশ, অহঃ + অহ = অহরহ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। সন্ধি বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।
- ২। সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।
- ৩। নিচের সূত্রগুলো অনুসরণে তিনটি করে উদাহরণ দাও।
 - (ক) মূর্ধন্য ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়।
 - (খ) চ্ ও জ্-এর পরে নাসিক্যধ্বনি তালব্য ঞ্ হয়।
 - (গ) অ-কার ভিন্ন অন্য স্বর পরে থাকলে বিসর্গের স্থলে র হয়।
- ৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর

উদ্ভত, বনস্পতি, বারেক, আদ্যন্ত, সম্রাট, ভবন, নয়ন, উজ্জ্বল, অন্বেষণ, সন্তান, নীরোগ, প্রাতরাশ
- ৫। সন্ধি কর

অভি + উদয়, নিঃ + চিহ্ন, চলৎ + শক্তি, যাবৎ + জীবন, ষষ্ + থ, চিৎ + ময়, খানি + এক, অতঃ + এব, দিক্ + মণ্ডল।
- ৬। কোনটি শুদ্ধ নির্দেশ কর

ক. স্বরে স্বরে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে / স্বরে আর ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে/ ব্যঞ্জনে আর স্বরে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

খ. ব্যঞ্জন সন্ধি এক / দুই/ তিন রকমের।

গ. স্বরসন্ধি ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনে হয় / স্বরে স্বরে হয়।

লক্ষণীয় : এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত নাসিক্য ব্যঞ্জনই বেশি প্রচলিত। যেমন – বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, তৎ + ময় = তন্ময়, মৃৎ + ময় = মৃন্ময়, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ইত্যাদি। এরূপ–উন্ময়ন, উন্নীত, চিন্ময় ইত্যাদি।

৩. ম্ এর পর যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্ণের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

ম্ + ক্ = ঙ্গ + ক্	শম্ + কা = শঙ্কা।
ম্ + চ্ = ঞ্চ + চ্	সম্ + চয় = সঞ্চয়।
ম্ + ত্ = ন্ + ত্	সম্ + তাপ = সন্তাপ।

এরূপ – কিস্কৃত, সন্দর্শন, কিন্নর, সম্মান, সম্প্রদান, সন্মুখ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : আধুনিক বাংলায় ম্-এর পর কণ্ঠ্য-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ স্থানে প্রায়ই ঙ্গ না হয়ে অনুস্বার (ৎ) হয়।

যেমন– সম্ + গত = সংগত, অহম্ + কার = অহংকার, সম্ + খ্যা = সংখ্যা।

এরূপ – সংকীর্ণ, সংগীত, সংগঠন, সংঘাত ইত্যাদি।

৪. ম্-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব, কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার (ৎ) হয়। যেমন–

সম্ + যম = সংযম,	সম্ + বাদ = সংবাদ,	সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ,
সম্ + লাপ = সংলাপ	সম্ + শয় = সংশয়	সম্ + সার = সংসার,
সম্ + হার = সংহার।		

এরূপ – বারংবার, কিংবা, সংবরণ, সংযোগ, সংযোজন, সংশোধন, সর্বসহা, স্বয়ংবরা। ব্যতিক্রম : সম্রাট (সম্ + রাট)।

৫. চ্ ও জ্-এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন –

চ্ + ন = চ্ + ঞ্চ,	যাচ্ + না = যাচ্ঞা, রাজ্ + নী = রাজ্জী।
জ্ + ন = জ্ + ঞ্চ,	যজ্ + ন = যজ্জ,

৬. দ্ ও ধ্ এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, থাকলে দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

দ্ > ত্	তদ্ + কাল = তৎকাল
ধ্ > ত্	ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা।

এরূপ – হৃৎকম্প, তৎপর, তত্ত্ব ইত্যাদি।

৭. দ্ কিংবা ধ্-এর পরে স্ থাকলে, দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

বিপদ্ + সংকুল = বিপৎসংকুল। এরূপ – তৎসম।

৮. ষ্-এর পরে ত্ বা থ্ থাকলে, যথাক্রমে ত্ ও থ্ স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন–

কৃষ্ + তি = কৃষ্টি,	ষষ্ + থ্ = ষষ্ঠ।
---------------------	------------------

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সন্ধি

উৎ + স্থান = উত্থান সম্ + কার = সংস্কার, উৎ + স্থাপন = উত্থাপন,
সম্ + কৃত = সংস্কৃত, পরি + কার = পরিষ্কার।

এরূপ- সংস্কৃতি, পরিষ্কৃত ইত্যাদি।

১০. কতগুলো সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়

আ+ চর্য = আশ্চর্য, গো + পদ = গোম্পদ, বন্ + পতি = বনস্পতি
বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, তৎ + কর = তস্কর, পর্ + পর = পরস্পর,
মনস্ + ঈষা = মনীষা, ষট্ + দশ = ষোড়শ এক্ + দশ = একাদশ,
পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি ইত্যাদি।

৩. বিসর্গ সন্ধি

সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে পদের অন্তস্থিত র্ ও স্ অনেক ক্ষেত্রে অঘোষ উষ্মধ্বনি অর্থাৎ হ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিসর্গ(ঃ) রূপে লেখা হয়। র্ ও স্ বিসর্গ ব্যঞ্জনধ্বনিমালার অন্তর্গত। সে কারণে বিসর্গ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্গত। বস্তুত বিসর্গ র্ এবং স্-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ১. র্ - জাত বিসর্গ ও ২. স্-জাত বিসর্গ।

১. র্-জাত বিসর্গ : র্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে র্-জাত বিসর্গ। যেমন : অন্তর- অন্তঃ, প্রাতর- প্রাতঃ, পুনর- পুনঃ ইত্যাদি।

২. স্-জাত বিসর্গ : স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে স্-জাত বিসর্গ। যেমন : নমস্ - নমঃ, পুরস্ - পুরঃ, শিরস্ - শিরঃ ইত্যাদি।

বিসর্গের সাথে অর্থাৎ র্ ও স্-এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বিসর্গ সন্ধি দুইভাবে সাধিত হয় : ১. বিসর্গ + স্বর এবং ২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন।

১. বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

অ-ধ্বনির পরস্থিত (অঘোষ উষ্মধ্বনি) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + ঃ + অ - এ তিনে মিলে ও-কার হয়। যেমন- ততঃ + অধিক = ততোধিক।

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি

১. অ-কারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গের পর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি কিংবা অন্তস্থ য, অন্তস্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ-কার ও স্-জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও-কার হয়। যেমন- তিরঃ + ধান = তিরোধান, মনঃ + রম = মনোরম, মনঃ + হর = মনোহর, তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।

২. অ-কারের পরস্থিত র্-জাত বিসর্গের পর উপর্যুক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন- অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান, পুনঃ + আয় = পুনরায়, পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত, অহঃ + অহ = অহরহ।

এরূপ - পুনর্জন্ম, পুনর্বার, প্রাতরুত্থান, অন্তর্ভুক্ত, পুনরপি, অন্তবর্তী ইত্যাদি।

২. ঈ-প্রত্যয় যোগে

(ক) সাধারণ অর্থে : নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, রজক-রজকী, কিশোর-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী, চতুর্দশ-চতুর্দশী, ষোড়শ-ষোড়শী ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : সিংহ-সিংহী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, মানব-মানবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কুমার-কুমারী, ময়ূর-ময়ূরী ইত্যাদি।

৩. ইকা-প্রত্যয় যোগে

(ক) যেসব শব্দের শেষে ‘অক্’ রয়েছে সেসব শব্দে ‘অক্’ স্থলে ‘ইকা’ হয়। যেমন : বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ইত্যাদি। কিন্তু গণক-গণকী, নর্তক-নর্তকী, চাতক-চাতকী, রজক-রজকী (বাংলায়) রজকিনী।

(খ) ক্ষুদ্রার্থে ইকা যোগ হয়। যেমন : নাটক-নাটিকা, মালা-মালিকা, গীত-গীতিকা, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি। (এগুলো স্ত্রী প্রত্যয় নয়, ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়।)

৪। আনী-যোগ করে : ইন্দ্র-ইন্দ্রানী, মাতুল-মাতুলানী, আচার্য-আচার্যানী (কিন্তু আচার্যের কর্মে নিয়োজিত অর্থে আচার্য)। এরূপ : শূদ্র-শূদ্রা (শূদ্র জাতীয় স্ত্রীলোক), শূদ্রানী (শূদ্রের স্ত্রী), ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া/ক্ষত্রিয়ানী ইত্যাদি।

আনী-প্রত্যয় যোগে কোনো কোনো সময় অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন-অরণ্য-অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম-হিম্যানী (জমানো বরফ)।

৫. ঈনী, নী, যোগে : মায়াবী-মায়াবিনী, কুহক-কুহকিনী, যোগী-যোগিনী, মেধাবী-মেধাবিনী, দুঃখী-দুঃখিনী ইত্যাদি।

৬. বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ

(ক) যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে ‘তা’ রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে ‘ত্ৰী’ হয়। যেমন- নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী।

(খ) পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত্, বান্, মান্, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যথা : সৎ-সতী, মহৎ-মহতী, গুণবান-গুণবতী, রূপবান-রূপবতী, শ্রীমান-শ্রীমতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরীয়সী।

(গ) কোনো কোনো পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন- সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, রাজা-রানী, যুবক-যুবতী, শ্বশুর-শাশুড়ি, নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, দেবর-জা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী ইত্যাদি।

বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ : খান-খানম, মরদ-জেনানা, মালেক-মালেকা, মুহতারিম-মুহতারিমা, সুলতান-সুলতানা।

নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ : সতীন, অর্ধাজিনী, কুলটা, বিধবা, অসূর্যম্পশ্যা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য

- (ক) কতগুলো বাংলা শব্দে পুরুষ ও স্ত্রী দু-ই বোঝায়। যেমন— জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু ইত্যাদি।
- (খ) কতগুলো শব্দে কেবল পুরুষ বোঝায়। যেমন—কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার ইত্যাদি।
- (গ) কতগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন— সতীন, সৎমা, সধবা ইত্যাদি।
- (ঘ) কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটি করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যথা— দেবর—ননদ (দেবরের বোন)/জা (দেবরের স্ত্রী), ভাই—বোন এবং ভাবী (ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক—শিক্ষয়িত্রী (শিক্ষিকা) (পেশা অর্থে) এবং শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী), কন্ধু—বান্ধবী (মেয়ে বন্ধু) এবং বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী), দাদা—দিদি (বড় বোন) এবং বৌদি (দাদার স্ত্রী)।
- (ঙ) বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন : সুন্দর বলদ—সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে—সুন্দর মেয়ে, মেজ খুড়ো—মেজ খুড়ি ইত্যাদি।
- (চ) বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন— মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে (পাগলি হয়ে গেছে হবে না)। আসমা ভয়ে অস্থির (অস্থিরা হবে না)।
- (ছ) কুল—উপাধিরও স্ত্রীবাচকতা রয়েছে। যেমন : ঘোষ (পুরুষ) ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)।

অনুশীলনী

- ১। পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ২। বাংলা শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায়?
- ৩। বাংলায় আগত তৎসম শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায়?
- ৪। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের পাঁচটি উদাহরণ দাও।
- ৫। শূন্য কর : বিধবা স্ত্রী, বেগমা
- ৬। পার্থক্য নির্ধারণ কর
দিদি—বৌদি, শিক্ষিকা—শিক্ষয়িত্রী, আচার্য—আচার্য্যিনী, শূদ্রা—শূদ্রানী
- ৭। ঠিক উত্তরে টিক (✓) দাও।
(ক) নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ— মা, কন্যা, ছাত্রী, বালিকা, বোন/বিমাতা, বিধবা, বন্ধ্যা, ভাইনী;
(খ) নিত্য পুরুষবাচক শব্দ— বাবা, দাদা, হরিণ, পতি, শিশু/ঢাকী, কবিরাজ, কৃতদার;
(গ) সংস্কৃত নী প্রত্যয়— মাতুলানী/ইনি প্রত্যয়—মায়াবিনী।